প্রথম আলো

কলাম

মতামত

বাচ্চাদের ভর্তিতে পরীক্ষা, উপাচার্য ‘ভর্তিতে’ নেই!

মনোজ দে

প্রকাশ: ২৯ মার্চ ২০২৬, ১৭: ১৭

স্কুলে ভর্তিতে লটারি প্রথা বাদ দিয়ে আবারও ভর্তি পরীক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার *ফাইল ছবি*

বিএনপির গত মেয়াদে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। পাবলিক পরীক্ষায় নকল বন্ধে তাঁর দৌড়ঝাঁপ ও প্রচেষ্টার গল্প একসময় মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকে যাঁরা পাবলিক পরীক্ষাগুলো দেখেছেন, তাঁরা জানেন পরীক্ষায় নকল কতটা অভিনব শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। হাতের তালু, স্কেল, জ্যামিতি বক্সে রাত জেগে উত্তর লেখা হতো। অনেকে কলমের ওপর প্রশ্নের উত্তর লিখতেও পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।

চিন্তা করা যায়, হাত কতটা সূক্ষ্ম হলে আর চোখ কতটা নিখুঁত হলে, এমন করে লেখা যায়, আর সেটা দেখে দেখে পরীক্ষার হলে লেখা যায়। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোর আশপাশে একেবারে মেলা বসে যেত। পরীক্ষার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন বাইরে চলে আসত। পরীক্ষার্থীর চেয়ে বাইরের সহায়তাকারীরা বসে যেতেন বইয়ের পাতা খুঁজে প্রশ্নের উত্তর বের করতে। পাতা কেটে কিংবা কাগজে লেখা হতো সেই প্রশ্নের উত্তর। সাধারণত এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা হতো। ফলে যাঁরা উত্তর খুঁজে বের করতেন, তাঁদেরকে কেউ তালের পাখা দিয়ে বাতাস করতেন, আবার কেউ ডাব কেটে মুখের সামনে ধরতেন! সে-ও একটা দিন গেছে দেশে!

রাজনৈতিক অনুগতদের উপাচার্য পদে বসানো ও বিদ্যালয়ে ভর্তিতে পরীক্ষা চালুর সিদ্ধান্তে খুব স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বড় প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পরীক্ষা লাগবে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য 'ভর্তিতে' পরীক্ষা লাগবে না?—কেউ কেউ এমন প্রশ্ন তুলেছেন। শুরুতেই এমন সিদ্ধান্তে শিক্ষা নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা কী তা নিয়ে প্রশ্ন ও সংশয় জন্ম হয়েছে। নাগরিকদের সহজ এই প্রশ্ন ও সংশয়ের উত্তর কি সরকার দেবে?

দুই.

পাবলিক পরীক্ষা নকলমুক্ত করতে পারলেও গত বিএনপি সরকারের আমলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা খাতের চিত্র স্বস্তিদায়ক ছিল না। ক্যাম্পাসগুলোতে সেশনজট ব্যাপকভাবে (পাঁচ বছরের অনার্স-মাস্টার্স শেষ হতে অনেকের সাত বছর লেগে গিয়েছিল) ফিরে এসেছিল। ছাত্রদলের দুই দলের সংঘর্ষের সময় গুলিতে বুয়েট শিক্ষার্থী সাবেকুন নাহার সনি নিহত হওয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের জেরে মাঝরাতে পুরুষ পুলিশ প্রবেশের মতো ঘটনাগুলো ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল।

এ ছাড়া বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উচ্চশিক্ষার কৌশলপত্র তৈরি করেছিল। সেখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজেদের আয়ে চলতে হবে। এর আলোকেই আমরা দেখেছি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মডেলের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গত দেড় দশকে বাংলাদেশে সরকারি ব্যয়ে যে কয়টা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, সব কটিই এই মডেলের বিশ্ববিদ্যালয়। পাবলিক ও বেসরকারি দুই মডেলের মাঝখানের এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যয়ের একটা বোঝা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বহন করতে হয়। একই সঙ্গে পাকিস্তান পর্বে দীর্ঘ আন্দোলনের পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ত্রিয়াত্তরের অধ্যাদেশ থেকে যে স্বায়ত্তশাসন ও একাডেমির স্বাধীনতা পেয়েছিল, সেটা কেড়ে নিয়ে পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

তিন.

দেড় যুগ পর ক্ষমতায় ফিরেছে বিএনপি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন এহছানুল হক মিলন। শপথ গ্রহণের দিন তাঁর হাইজাম্প দিয়ে দড়ির বাধা পেরোনোর ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজের উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রশংসিতও হয়েছে।

তবে কিছু সিদ্ধান্ত বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। প্রথম বিতর্কটা শুরু হয়ে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচালনা কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করার আলোচনা ওঠার কারণে। প্রথম আলোর খবর জানাচ্ছে, ১০ মার্চ সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের উপস্থিতিতে সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের নিয়ে আলোচনার সময় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হতে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রি থাকার বাধ্যবাধকতা শিথিল করার বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের পর আলোচনা শুরু হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই ভাবনা থেকে সরে আসে।

চার.

ঈদের ছুটির আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জোড়া সিদ্ধান্তকে শিক্ষাক্ষেত্রে জোড়া আঘাত হিসেবে দেখা যেতে পারে। দেশের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগের ঘোষণা দেন মন্ত্রী। নতুন উপাচার্যরা বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষক সংগঠনের সাবেক বা বর্তমান নেতা। রাজনৈতিক আনুগত্যের মাপকাঠিতে উপাচার্য নিয়োগ করা নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই বড় প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এত বড় অভ্যুত্থান, এত মানুষের প্রাণহানির পরও বিশ্ববিদ্যালয়কে দলীয় প্রতিষ্ঠান বানানোর চিন্তা কেন, সেটা মোটেই বোধগম্য নয়। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের পাল্টায় মন্ত্রী প্রশ্ন করেছেন, কারও দল করা কি অযোগ্যতা? প্রশ্নটা এখানে আসলে দল করা কিংবা না করা নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে, উপাচার্য নিয়োগের মানদণ্ডটা কী ছিল, তা নিয়ে পরিষ্কার কোনো ভাষ্য জানা যায়নি।

ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর ও চট্টগ্রাম—এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী। এই আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের নির্দিষ্ট বিধি আছে। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগের মূল বিধান হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে নির্বাচিত তিন সদস্যের একটি প্যানেল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে এবং সেখান থেকে একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে। এ বিধানের উদ্দেশ্য ছিল উপাচার্য নির্বাচনে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ প্রকৃত পক্ষে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষককে খুঁজে বের করতে পারে, তা নিয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যেই বড় প্রশ্ন রয়েছে। এরপরও কোনো সরকারই উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে এই বিধিটুকুও অনুসরণ করেনি। বরং দলীয় আনুগত্যই উপাচার্যসহ প্রশাসনিক পদে নিয়োগের একমাত্র যোগ্যতা হয়ে উঠেছে।

চব্বিশের অভ্যুত্থানের সূতিকাগার বিশ্ববিদ্যালয় হলেও অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে কোনো রহস্যময় কারণে শিক্ষা সংস্কারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও কোনো মানদণ্ড তৈরি করা হয়নি; বরং গুপ্ত, সুপ্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর শিক্ষকদের উপাচার্য পদে বসানো হয়েছিল। বিএনপি নেতাদের দিক থেকে বারবার করে অভিযোগ করা হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জামায়াতের কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ডাকসু, জাকসু, রাকসুসহ ছাত্রসংগঠনগুলোর নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের ভালো ফলাফলের পেছনেও এটিকে একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন তাঁরা।

পাঁচ.

আওয়ামী লীগের আমলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালগুলোকে দলীয় সংগঠনের সম্প্রসারিত কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। দলীয়করণ এতটাই চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল যে উপাচার্য থেকে শুরু করে দারোয়ান, মালি সবার নিয়োগ, পদোন্নতির একমাত্র মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজনৈতিক পরিচয়। ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগকে শিক্ষার্থীদের দমনে ঠ্যাঙাড়ে সংগঠনে পরিণত করা হয়েছিল।

শুধু ছাত্রলীগ নয়, দলীয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ এই নিপীড়নের অংশীদার হয়ে উঠেছিল। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিপুল অঙ্কের উন্নয়ন প্রকল্প ঘিরে রাজনৈতিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি শক্তিশালী নেক্সাস গড়ে উঠেছিল। ফলে শিক্ষা মানেই হয়ে উঠেছিল প্রকল্প আর ভাগ-বাঁটোয়ারা। অন্যদিকে শিক্ষার মান দিন দিন তলানিতে নেমেছে। যে দল যখন ক্ষমতায় থেকেছে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই রাজনীতিকীকরণের আশ্রয় নিয়েছে।

এই নিপীড়নমূলক ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্রোহই দেশকে গণ-অভ্যুত্থানের পথে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে অতি দরকারি সংস্কারটুকুও হয়নি। দলীয় আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে কাউকে উপাচার্য নিয়োগের সহজ সূত্র থেকে নতুন সরকারও বেরিয়ে আসতে পারেনি। আমাদের ইতিহাসের বাস্তবতা হলো, ইতিহাস থেকে কেউই শিক্ষা নিতে আগ্রহী নন।

পাঁচ.

উপাচার্য নিয়োগের পাশাপাশি বিদ্যালয়ে ভর্তিতে লটারি প্রথা বাতিল করে পুরোনো ভর্তি পরীক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করে পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি করা হবে। পাঁচ-ছয় বছরের একটি শিশুর মেধা যাচাইয়ের চিন্তাটা কতটা বিবেচনাপ্রসূত, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন থেকে যায়। তবে এই সিদ্ধান্তে যে ভর্তি-বাণিজ্য ও কোচিং ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দেওয়া হলো, সেটা আগের তিক্ত অভিজ্ঞতা তা বলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

জাতীয় সংসদে একজন সংসদ সদস্য বিদ্যালয়ে ভর্তিতে লটারি প্রথা বাতিল করার প্রশ্নটি তোলেন। শিক্ষামন্ত্রী সেটি যাচাইয়ের কথা বলেন। দুই দিন পরেই সংবাদ সম্মেলন করে সেটি বাতিল করেন, পরীক্ষা প্রথা চালু করেন। সরকারের কাছে লটারি প্রথার ভর্তি যদি সমস্যাজনক বলে মনে হয়, অন্তত শিক্ষাবিদদের সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করে পদ্ধতিটাকে উন্নত করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তড়িঘড়ি করে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার পেছনে যুক্তিটা কী, সেটা মোটেই বোধগম্য নয়।

রাজনৈতিক অনুগতদের উপাচার্য পদে বসানো ও বিদ্যালয়ে ভর্তিতে পরীক্ষা চালুর সিদ্ধান্তে খুব স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বড় প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পরীক্ষা লাগবে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ‘ভর্তিতে’ পরীক্ষা লাগবে না?—কেউ কেউ এমন প্রশ্ন তুলেছেন। শুরুতেই এমন সিদ্ধান্তে শিক্ষা নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা কী তা নিয়ে প্রশ্ন ও সংশয় জন্ম হয়েছে। নাগরিকদের সহজ এই প্রশ্ন ও সংশয়ের উত্তর কি সরকার দেবে?

মনোজ দে, প্রথম আলোর সম্পাদকীয় সহকারী

মতামত লেখকের নিজস্ব

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো